সীমান্ত সংগ্রহ

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২

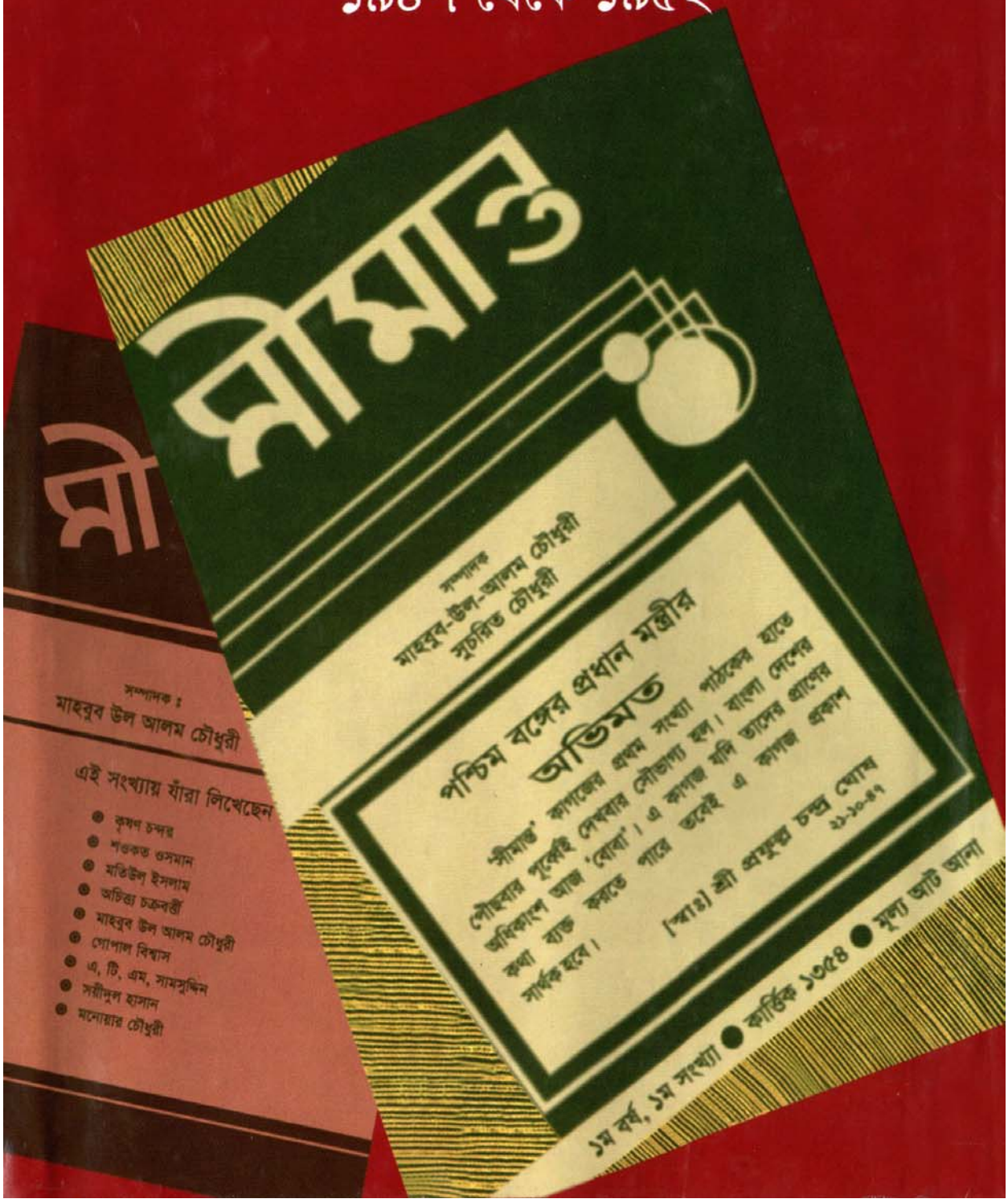

সীমান্ত সংগ্রহ

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২

পাকিস্তান আমলের প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা
মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্পাদিত
মাসিক 'সীমান্ত'-এর পুনমুদ্রণ

সম্পাদক
ড. ইসরাইল খান
জওশন আরা রহমান

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ, বিএ অনার্স; এমএ
স্বত্বাধিকারী, পালক পাবলিশার্স
৮/২, নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
যোগাযোগ : ১৭৯/৩, ফকিরেরপুল
জিপিও বক্স নং ৪১৫, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৫৮১৬, মোবাইল : ০১৭২০৩০৮৮৬১

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১২
জুন ২০০৫

গ্রন্থস্বত্ব
ইখতিসাদ আহমেদ
ইবতিসাম আহমেদ

প্রচ্ছদ
সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা

SHIMANTO SANGRAHA: Collection of monthly Shimanta, by Mahbub ul Alam Chowdhury, 1947-1952, Edited by Dr. Israil Khan and Jowshan Ara Rahman. Published by Forkan Ahmad. Proprietor, Palok Publishers, 8/2, North South Road, Purana Palton, (Contact : 179/3, Fakirerpool) GPO Box No 415, Dhaka-1000, Bangladesh. Cover designed by Sabih-ul Alam. First published June 2005, Price Tk. 550.00; US $ 40

ISBN 984 445 168 10

উৎসর্গ

বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী
দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির
দুই মহান সাধককে–
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
অন্নদাশঙ্কর রায়

সীমান্ত পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সীমান্ত' এক অনন্য সাময়িকপত্র তা এর পুনর্মুদ্রণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হলো। সমাচার দর্পণ (১৮১৮) থেকে লোকায়ত (১৯৮২), সুন্দরম (১৯৮৫) পর্যন্ত শত সহস্র বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন পড়েছে মাত্র গুটি কয়েকের। বাংলা পত্রিকাজগতে জানা মতে প্রথম পুনর্মুদ্রিত পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।

এরপর হুবহু মুদ্রিত পত্রিকা কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' ও 'লাঙল'। মাঝখানে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আনিসুজ্জামান, মুনতাসীর মামুন প্রমুখ বিদ্বানের সম্পাদনায় বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে স্বনির্বাচিত বা সুনির্বাচিত রচনাংশ দ্বারা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকায়, মুনতাসীর মামুন 'ঢাকা প্রকাশ'-এর; আবদুল হাই শিকদার মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর 'হক কথা' এবং কলকাতায় 'আনন্দবাজার', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে চয়ন বা নির্বাচন করে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা মিশ্ররচনার সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে হুবহু মুদ্রিত পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন', 'ধূমকেতু', 'লাঙল' ও 'সীমান্ত'ই। এই ঘটনারাজির মধ্যে লক্ষণীয় হলো রবীন্দ্রনাথের কোনো পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হয়নি। আর কাজী নজরুলের পত্রিকা দুটি ছাপা হয়েছে ফটোঅফসেটে। 'বঙ্গদর্শন' এবং 'সীমান্ত' পুনরায় কম্পোজ হয়েছে। নতুনকালের প্রবক্তা 'কল্লোল', 'কবিতা' প্রভৃতি পুরোটা পুনর্মুদ্রিত বোধ হয় নাও হতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে 'বঙ্গদর্শন', 'ধূমকেতু', 'লাঙল' প্রভৃতির সঙ্গে 'সীমান্ত'র যোগসূত্র বা যোগসাজস সৃষ্টি করা কী অত্যুক্তি নয়? না, গভীরভাবে সে ঘটনা তলিয়ে দেখা গেছে। 'বঙ্গদর্শন' যেমন সেকালকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছে, বাঙালি জাতিকে নতুন দিশা দেবার জন্যে 'সীমান্ত'ও তেমনি পাকিস্তান সৃষ্টি ঊষালগ্নে পাকিস্তানবাদী বাঙালি সমাজকে ভাষা, জাতিসত্তা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মানবিকতার মুক্তির প্রশ্নকে উচ্চকিত করে পাকিস্তান দর্শন করেছে।

'সীমান্তে'র দর্শনে দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রতিচ্ছবি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছে। আর এ কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি প্রস্তুত করার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রগতিশীল সাময়িকপত্র প্রকাশের ধারা সৃষ্টি করে 'সীমান্ত' বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ পত্রিকার মর্যাদা লাভ করেছে।

বিগত দুই দশকে এদেশের পত্র-পত্রিকার পাতাতেও 'সীমান্ত'র ভূমিকা বা অবদান সম্পর্কে বিস্তর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। গত দুশ' বছরে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা সম্পর্কে এত লিখিত হয়নি। 'সীমান্ত'র অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োচিত প্রকাশনা সম্পর্কে জাতি ধর্ম দলমত নির্বিশেষে সকলেই আজ একমত।

কিন্তু এমন একটি পত্রিকা সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম ও তার পূর্ব পুরুষদেরও চাক্ষুষ ধারণা ছিল না। আর একটির অধিক কপিও কোনো কোনো সংখ্যা 'সীমান্ত'র অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া সাহিত্যিক-শৈল্পিক-রাজনৈতিক তথা কালিক চাহিদা পূরণে 'সীমান্ত' এখনও সক্ষম; যদিও তা প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ষাট বছর আগে। সেকালের কোনো পত্রিকার পুরোটাই আজ আর কেউ নিতান্ত বাধ্য না হলে সানন্দে সাগ্রহে পাঠ করবেন না। অথচ 'সীমান্ত' পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সময় ও তারিখ মনে রেখে এখনও যে কোনো সচেতন সহৃদয় হৃদয়-সংবেদী পাঠক কৌতূহলের সঙ্গেই সঙ্গী করে নেবেন 'সীমান্ত'কে। আর তা থেকে আহরণ করবেন তিনি রাজনৈতিক, মানবিক, প্রগতিশীল চেতনা, আর ঐতিহাসিকেরা নেবেন আকর তথ্য।

বলা আবশ্যক 'সীমান্ত'র পৃষ্ঠা থেকে তথ্য সংকলিত করে এ পর্যন্ত অনেক জাতীয় ইতিহাস প্রণীত হয়েছে। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিলেন পূর্ব বাংলার যে-সকল বামপন্থী রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ সে-সবের মধ্যে 'সীমান্ত' পত্রিকা ও এর কর্ণধার মাহবুব উল আলম চৌধুরীর (১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত) নেতৃত্বে চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ড. সাঈদউর রহমান, ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী প্রমুখের গবেষণায় 'সীমান্ত' অবলম্বনে এসব তথ্য পরিবেশিত

হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিক সাংস্কৃতিক গতিপ্রবাহের দিক নির্দেশক এমন একটি পত্রিকার তাৎপর্য ও মূল্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যে কোনো প্রধান সাময়িকপত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

অতএব, 'সীমান্ত' সম্পর্কে উচ্চ ধারণাকে কোনো অবস্থাতেই অত্যুক্তি মনে করা সঙ্গত হবে না বলেই আমরা বিশ্বাস করি। আর সে কারণেই 'সীমান্ত'কে হুবহু উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একাজে 'সীমান্ত' সম্পাদক জনাব মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও পালক পাবলিশার্সের কর্ণধার জনাব ফোরকান আহমদ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের ঋণ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

'সীমান্ত' বাংলাদেশ ও তৎকালীন সমাজের দর্পণ ও দলিলের মর্যাদা লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু পত্রিকার পুরো ফাইল দুর্লভ হয়ে পড়েছে। এর কারণ নিহিত রয়েছে পত্রিকার এবং এর সম্পাদকের চারিত্র্যের মধ্যেই। পত্রিকা ও এর সম্পাদকের জীবনেতিহাসে জানা যায় যে, এই পত্রিকার অফিস পুলিশ কর্তৃক তছনছ হতো, সম্পাদকীয় কার্যালয় বারে বারে পরিবর্তিত হতো। সম্পাদককে আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন-যাপন করতে হয়েছে। তাঁর মাথার ওপর ঝুলন্ত থাকতো হুলিয়ার হুমকি। ফলে থরে থরে সাজিয়ে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি 'সীমান্ত'কে।

আর এটাইতো প্রকৃত দেশপ্রেমিক সংগঠককর্মীর বৈশিষ্ট্য। তাঁরা কাজ করেন আপন প্রেরণায়। ইতিহাস সৃষ্টির করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচারমুখী যে-সকল কাজ, তাতো শেষ পর্যন্ত মর্যাদার হয় না। 'ক্লাসিক্স'-এর ইতিহাসও সে কথা সমর্থন করে। কোনো ক্লাসিকই কী সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে? কালের করাল গ্রাস থেকে যা বেঁচে টিকে থাকে, তা দিয়েই সেই কালকে ছুঁয়ে যেতে হয়। 'সীমান্ত'র প্রাপ্ত মাত্র ১৩টি সংখ্যা দিয়েই আমাদেরকে সেকালে প্রকাশিত 'সীমান্ত'র পুরো কার্যক্রমকে অনুধাবন করে নিতে হবে।

'সীমান্ত' মাসিক হিসেবে কার্তিক ১৩৫৪, নভেম্বর ১৯৪৭ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। আর ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারির ঘটনায় 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' লিখে সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী হুলিয়া মাথায় নিয়ে পলাতক জীবন-যাপন করায় 'সীমান্ত' প্রকাশনা স্থগিত হয়ে যায়। এই পাঁচ বছরে 'সীমান্ত' মূলত মাহবুব উল আলম চৌধুরীর একাগ্রতা এবং উদ্দীপনায় প্রকাশিত হয়। প্রথম দু'বছর 'সীমান্ত' সম্পাদনায় মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সহযোগী ছিলেন সুচরিত চৌধুরী। পরের তিন বছর মাহবুব উল আলম চৌধুরীর একক সম্পাদনায় 'সীমান্ত' প্রকাশিত হয়। 'সীমান্ত'র 'দাঙ্গা-বিরোধী' ও 'সাহিত্য-সম্মেলন সংখ্যা' তাঁরই একক উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সীমান্তে'র মাধ্যমে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের পক্ষে এদেশে গোটা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তা সত্ত্বেও সুচরিত চৌধুরী প্রথম দেড় দু'বছরে যে সহযোগিতা করেন তাও মূল্যবান। তিনি আজ প্রয়াত। স্বকীয় কৃতী ও কর্মের জন্য সুচরিত চৌধুরী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'সীমান্ত' পুনর্মুদ্রণের এই শুভক্ষণে তাঁকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

ড. ইসরাইল খান
জওশন আরা রহমান
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

১৯৪৭ সালে কোন পরিস্থিতিতে কি উদ্দেশ্য নিয়ে সীমান্ত বের করি

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো বটে কিন্তু শান্তি এলো না মানুষের মনে। সাম্রাজ্যবাদ যেদিক দিয়ে হেঁটে গেছে, সেদিক হয়েছে দ্বিখণ্ডিত। দ্বিখণ্ডিত হয়েছে কোরিয়া, জার্মানি, ভারতবর্ষ। যুদ্ধের পরপরই দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলন প্রকট হয়ে ওঠে। দেশে দেশে স্বাধীনতার আন্দোলনকে নিপীড়নের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করে সাম্রাজ্যবাদ। ভারতেও স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে নানা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। দেশের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ এবং মানবতাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে শুরু হয় পাকিস্তান আন্দোলন।

স্বাধীনতার মূলধারার নেতৃত্বে ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেস মূলত অসাম্প্রদায়িক হলেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সুদৃঢ় ভিত প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। ফলে ব্রিটিশ শাসকেরা মুসলমানদের মুসলিম লীগ দলে একত্রিত করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে উপমহাদেশকে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করার পথে ঠেলে দেয়। এক দারুণ উত্তেজনায় বিষিয়ে ওঠে সমগ্র উপমহাদেশ। হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সম্ভাবনা রক্তের বন্যায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তরঞ্জিত হয়ে ওঠে গোটা দেশ। দেশজোড়া গণ-অভ্যুত্থান ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় মুখ থুবড়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িকতার অভিঘাতে কেঁপে ওঠে জনজীবনের ভিত্তিমূল। চেনা জীবনের আশ্রয় থেকে মানুষ নিক্ষিপ্ত হয় এক অচেনা জগতের পরিবেশে। সমাজ বিপ্লবের ব্যর্থ মহড়ায় কাতর হয়ে উঠি আমরা।

এক শ্রেণীর মুসলিম সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে র‍্যানেশাঁস সম্মেলনে একত্রিত হন। তাঁরা প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন বাঙালি সংস্কৃতি বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি নয়। এ সংস্কতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যুগের সংস্কৃতি। এটা খুবই উন্নত সংস্কৃতি হতে পারে, তবে এটা বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি নয়। ত্যাগের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদর্শ, ভক্তিবাদের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, সমস্তই উঁচুদরের আদর্শ। এই আদর্শকে বুনিয়াদ করে, নারীপ্রেমকে কেন্দ্র করে, হিন্দু শিল্প-সংস্কৃতিসেবী মনীষীরা যে সাহিত্য রচনা করেছেন, সে সবই হয়েছে খুবই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এবং তা পড়ে অপর সকলের মতো, মুসলমান রস পিপাসুরাও পিপাসা নিবারণ করে। কিন্তু সত্যি কথা এই যে, এই সংস্কৃতিতে ভক্তি-প্রেম যতই উঁচুদরের আদর্শ হোক, মুসলমানের তা জীবনাদর্শ নয় (সূত্র ঃ আবুল মনসুর আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান র‍্যানেশাঁস সম্মেলন, ১ জুলাই ১৯৪৪, মূল সভাপতির ভাষণ)।

এই স্বাতন্ত্র্যের দাবি জানিয়ে তিনি নিজেই আবার প্রশ্ন তোলেন, 'তবে কি বাংলার মুসলমানের কোনো সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই? তাকে কি তবে সাহিত্য সাধনায় ক খ থেকে শুরু করতে হবে? তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, না। অবস্থা এতটা নৈরাশ্যজনক নয়। বাংলার বর্তমান সাহিত্যে মুসলমানের কোনো দান নেই বলে বাঙালি মুসলমানের কোনো সাহিত্য নেই, একথা ঠিক নয়। বস্তুত মুসলমানের যেমন এক নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটি নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানি বাংলা সাহিত্য বা পুঁথি সাহিত্য। মাদ্রাসা, মক্তবে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাঠক যা থেকে জীবনের প্রেরণা পাচ্ছে।'

ওই সম্মেলনে তিনি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতিকে শুধু অস্বীকার করেন, তা নয়। তিনি বর্তমান ভাষার ইসলামি রূপান্তর এবং বর্ণমালা সংস্কারের কথাও তুলেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই মতামত তাঁর একার ছিল না। ব্যতিক্রম ছিলেন একমাত্র হবীবুল্লাহ বাহার। ওই সম্মেলনে পঠিত সমুদয় ভাষণের মূল সুর ছিল একটি। বাঙালি মুসলমানেরা আলাদা জাতি এবং তার সংস্কৃতি (তমদ্দুন) বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। বাঙালি সংস্কৃতি মানে হিন্দু সংস্কৃতি।

এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান-বিশ্বাসী এসব কবি-সাহিত্যিক ভাবলেন, আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি হবে ইসলামি এবং তা মুসলমানকে নিয়েই, মুসলমানের জন্য। আর সেই সাহিত্য সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হবে ইসলামি ভাবাদর্শে ধর্মীয় প্রবণতা নিয়েই। শুধু ভাষা নয়। এই সংস্কৃতি সাধনার ব্যাপারে

নিজেদের ঐতিহ্য কি হবে তা সুনির্দিষ্ট করতে গিয়ে তাঁরা বললেন, আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে যেখানে বিন্দুমাত্র হিন্দুয়ানী গন্ধ আছে, তা বর্জনীয়। ভাষার রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে তাঁরা বললেন, বাংলা ভাষার বর্তমান রূপ অবিকৃত রাখা যাবে না। এই ভাষাকে পরিশোধন করতে হবে। বর্তমান অবস্থায় যে ভাষা আছে, তাকে রাষ্ট্রভাষাও করা যাবে না। আরবি অক্ষরে বাংলা লিখতে হবে ইত্যাদি। আর এই ছিন্নমূল সংস্কৃতির নাম দিলেন তাঁরা তমদ্দুন। এসব কবি-সাহিত্যিকদের কবিতায়, প্রবন্ধে এমনকি গল্প ও নাট্য-সাহিত্যে প্রচুর আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে এমন এক উদ্ভট ভাষা সৃষ্টির কাজে তৎপর হয়ে উঠলেন, যাতে বাংলা ভাষার মূলত বিচ্ছেদ আনার চেষ্টা শুরু হলো বলা যায়। এই বিচ্ছেদের হাত থেকে বাংলা লোকজ সংস্কৃতিও বাদ গেলো না।

পহেলা বৈশাখের মতো সার্বজনীন উৎসবকে বলা হলো হিন্দুয়ানী। প্রদীপ জ্বেলে কোনো অনুষ্ঠান শুরু করাকে বলা হলো অনৈসলামিক। রবীন্দ্র এবং নজরুল জয়ন্তীতে তাঁদের ছবি টাঙানো পর্যন্ত চরম প্রতিবাদের মুখোমুখি হলো। পাকিস্তানি নীতির নামে দেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পশ্চাদমুখী করার আয়োজন তীব্রতর হলো। এই সংকীর্ণতাবোধ নিয়ে দেশ ভাগ হয়। সাংস্কৃতিক সংকটে সকল বুদ্ধিজীবীর চিন্তা বিক্ষিপ্ত। এমনি এক সময়, ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় রমনার মাঠে সদম্ভে ঘোষণা করেন Urdu and Urdu alone shall be the State language of Pakistan. তখন মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তার শীর্ষে। মুসলিম লীগের তল্পীবাহক বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক দ্বিজাতিতত্ত্বের স্বপ্নে বিভোর। রাজনীতি দিয়ে সরাসরি মোকাবেলা করা সম্ভব নয় জেনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জিন্নাহ্‌র সদম্ভ উক্তি, সরকারের নির্যাতন এবং গণবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়।

আগেই বলেছি, ১৯৪৫ সালে জেলা জজ শৈবাল গুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী অশোকা গুপ্তের আগ্রহে চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো আমরা রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করি। সম্ভবত এটাই চট্টগ্রামে প্রথম রবীন্দ্র জয়ন্তী। ওই বছরেই আমরা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের তিন দিনব্যাপী জন্মোৎসব পালন করি। ১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিপরীতে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সর্বদলীয়ভাবে ব্যাপক আকারে নজরুল জয়ন্তী উদযাপিত হয়। এটাই চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম নজরুল জন্মোৎসব। উৎসব শেষে বের করি বিরাট দাঙ্গাবিরোধী মিছিল। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রফিউদ্দিন সিদ্দিকী, আবদুল হক দোভাষ, আহমদ সাগীর চৌধুরী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আবুল ফজল, প্রফেসর হাবিবুর রহমান প্রমুখ। এছাড়া এতে যোগদান করেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের মামলার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বীর সংগ্রামী অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল এবং কল্পনা দত্ত।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে বের করি 'সীমান্ত'– একটি প্রতিবাদী মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। তখন আমার বয়েস মাত্র বিশ।

আমরা যারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুনিয়া জুড়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করার সংগ্রামে জনগণকে সামনে নিয়ে এসেছি, সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রাম করেছি, শিল্প-সাহিত্যকে জনগণের কাছে এনে তাদের রুটি-রুজির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি, বাম চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে কাজ করেছি – তারা দেশকে এই পশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দেয়াকে কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারেনি। মুক্তির পথ কোথায়, এর সন্ধানে আমরা 'সীমান্ত'কে সামনে নিয়ে এলাম। অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী সংস্কতির চর্চা, জাতীয় প্রগতি, বিশ্বশান্তি, শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা, বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে মূলধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সব রকম বিকৃতি, কুসংস্কার কূপমন্ডূকতা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং সম্প্রদায়গত বিভেদের বিরুদ্ধে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই আদর্শকে উচ্চে তুলে সৃষ্টিশীল সাহিত্য চর্চাকে উৎসাহিত করাই ছিল 'সীমান্তে'র মূল উদ্দেশ্য।

এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে মৈত্রী এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে আমরা উভয় বাংলার নবীন ও প্রবীণ লেখকদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহে সচেষ্ট হয়ে উঠি। ফলে দুই বাংলার মানবতাবাদী লেখক সম্প্রদায় 'সীমান্তে'র আত্মপ্রকাশকে অভিনন্দিত করে বিনা পারিশ্রমিকে লেখা দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পূর্ব বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ড.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি মঈনুদ্দীন, সুফিয়া কামাল, মনসুরুদ্দীন, জসীমউদ্‌দীন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মাহবুব উল আলম, ওহীদুল আলম, আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল বারী ওয়ারেসী, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, ফেরদাউস খান প্রমুখ।

নবীনদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক, কবি আতাউর রহমান, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, শামসুর রাহমান, কবি মতিউল ইসলাম, গোপাল বিশ্বাস, সুবোধরঞ্জন রায়, এবনে গেলাম নবী, সুধাংশু সরকার, সুচরিত চৌধুরী, কেশব চৌধুরী, বিজিত কুমার দত্ত, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান, মর্তুজা বশীর, আবদুল গনি হাজারী, সাইফুল আলম, সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিসির), সমরেন্দ্র দত্ত, উৎপল চৌধুরী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, দেবপ্রিয় বড়ুয়া, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, শুভাশীষ চৌধুরী, ননী সেনগুপ্ত, শহীদ সাবের, রুস্তম খান, আইনুন্নাহার, নুরুন্নাহার প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গের অন্নদাশঙ্কর রায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জীবন চক্রবর্তী, সলিল চৌধুরী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিভূতি চৌধুরী, সুলেখা সান্যাল, রবীন্দ্র মজুমদার, রামেন্দু দেশমুখ, পূর্ণেন্দু পত্রীসহ আরো অনেক কবি-সাহিত্যিক লেখা দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেন। তাঁদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় আমার অন্তর এখনো পরিপূর্ণ।

'সীমান্তে' গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস ছাড়াও থাকতো নিয়মিত পুস্তক পরিচয়, পাঠকের মতামত, বিশ্বশান্তির উপর নিয়মিত ফিচার এবং দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিল্পী সাহিত্যিকদের মূল্যবান লেখা। খাজা আহমদ আব্বাস, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিক্‌মত, কিষণ চন্দর, জন স্ট্রেমী, কর্ণফোর্ড, মুলকরাজ আনন্দ, ইছমত চুঘতাই, ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল, ইলিয়া এরেনবুর্গ, হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখার অনুবাদ প্রায় অতি সংখ্যায় স্থান পেতো। অনুবাদ করতেন ঢাকার ইফতেখারুল আলম (কিচলু), শওকত ওসমান, আহমেদুল কবীর, সানাউল হক, আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, মাহবুব উল আলম চৌধুরী প্রমুখ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'সীমান্তে'র উদ্যোগে চট্টগ্রামে আবদুল হক দোভাষকে সভাপতি এবং আমাকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় বিশ্বশান্তি পরিষদ। এই পরিষদ পারমাণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের দাবিতে ১৯৫০ সালে সাত লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। সংগ্রহকারীদের মধ্যে কারো কারো নাম আমার এখনো মনে পড়ে। আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, কিশলয় সেনশর্মা, আহমেদুর রহমান আজমী, চিত্ত সিং, ননী সরকার, বিনোদ দাশগুপ্ত।

এই স্বাক্ষরপত্র সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে (বিশ্বশান্তি আন্দোলনের হেড কোয়ার্টার) পাঠানো হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি শান্তি সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ পাই। কিন্তু ওই সময় সরকার আমার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে। সেই থেকে আমি উনিশ বছর দেশের বাইরে যেতে পারিনি।

১৯৫০ সালে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তখন সীমান্তের শিল্পী-সাহিত্যিকরা রফিউদ্দিন সিদ্দিকীকে সভাপতি এবং আমাকে সম্পাদক করে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। নাম দেয়া হয় শান্তি সম্মেলন। এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তরুণদের নিয়ে একটি শান্তিফৌজও গঠন করা হয়। তারা মহল্লায় মহল্লায় শান্তির বাণী প্রচার করে। গানের মাধ্যমে (ও ভাই দেশ ছাইড়া যাইওনা/একভাই যখন বাঁইচা আছি আর কোনো ভয় কইরো না ঃ লেখক মাহবুব উলম আলম চৌধুরী) যাতে দুস্কৃতিকারীদের মনে ভয় এবং সংখ্যালঘুদের মনে আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার হয়, তার পরিবেশ তৈরি করতে সচেতন প্রচেষ্টা চালায়।

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর মোতাহের হোসেন চৌধুরী লেখেন ঃ 'তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সজীব মনুষ্যত্ববোধে আমরা সকলেই মুগ্ধ। নিরাশার আঁধারে তারাই আমাদের আশার আলো।' দাঙ্গার বিরুদ্ধে ওই বছরেই (বৈশাখ, ১৩৫৭) সীমান্ত বড় আকারে বিশেষ সংখ্যা বের করে। এই প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩৫৭) মার্কসীয়তত্ত্ববিদ গোপাল হলদার লেখেন ঃ

"হত্যার অধ্যায় থেমেছে, তিনমাস ধরে আমরা দিল্লী-করাচির চুক্তিকৃত সৌহার্দ্যের আবহাওয়ায় বাস করছি। দিল্লীর সরকারি হিসাবে শুনেছি, লোকের আস্থা ফিরে আসছে। এবং শিয়ালদহ স্টেশনে দেখছি সে আস্থার অবস্থা। পূর্ব বাংলার সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এমনি সময়ে হাতে এসে পৌঁছল 'সীমান্ত' নামে মাসিকপত্রের 'দাঙ্গাবিরোধী সংখ্যা'। পূর্ব বাংলায় দাঙ্গাবিরোধী মানুষ আছেন এবং তাঁরা আপনাদের সেই মতামত ঘোষণা করতে ভীত নন। এই সংবাদ আমরা পশ্চিম বাংলার মানুষরা কয়জন জানি? কয়জন তা বিশ্বাস করি? তবু সেই অভ্রান্ত ঘোষণা নিয়ে এসেছে 'সীমান্ত' আর সে একাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের একাধিক বাংলা মাসিকপত্রে এই প্রমাণ। পশ্চিম বাংলা থেকে এমনি 'কোনো দাঙ্গাবিরোধী' সংখ্যার আশ্বাস দিয়ে কোনো সাময়িকী এ সময়ে পূর্ব বাংলায় গিয়েছে কিনা জানি না। এ প্রশ্ন তুলতেও ভয় পাই। কারণ তৎক্ষণাৎই উঠে পড়বে এই তর্ক – কোন বাংলা কতটা দাঙ্গামুখী। তারপর কে ঢিল ছুঁড়ল, প্রথম কবে; আর কারা হত্যা করেছে বেশি, কারা সেদিকে কতটা পিছিয়ে আছে। অসহ্য! ঘৃণার সঙ্গে এ তর্ক বর্জন করতে চাই।

তথাপি জিজ্ঞাসা করতে হয়– পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি-সেবকদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই ১৯৫০-এর দুর্দিনে এরূপ কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে কিনা। কারণ, এখনো বাঙালি সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র পশ্চিম বাংলা। আর সে সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা। কিন্তু এরূপ সুস্পষ্ট কোনো প্রয়াস কলকাতার সংস্কৃতির সেবকদের পক্ষ থেকে সংস্কৃতির এই দুর্যোগে হয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না। দু'একটি মিলন চক্রের চেষ্টার কথা জানি, তাও সার্থক আকার লাভ করতে পারেনি।

অথচ একথা সত্য যে, কি পূর্ব বাংলা, কি পশ্চিম বাংলায় কোনোখানেই দুষ্কৃতকারী বা দাঙ্গাজীবীদের সংখ্যা বড় জোর দু'এক লক্ষের বেশি নয়। সাধারণ সুস্থ, শান্তিকামীদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, আসলে তাঁরাই শতকরা ৯০ জন। কিন্তু তাঁরা সক্রিয় নন, সংগঠিত হতে জানেন না বরং নানাবিধ অকল্যাণকর প্রচারে তাঁদের সেই শুভবুদ্ধিও এক একবার আচ্ছন্ন হয়। আর সাধারণ সময়েও সংগঠনেচ্ছা তাঁদের অবসন্ন হয়ে থাকে। তাঁদের অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তার এই সুযোগ নিয়েই দাঙ্গাজীবীরা সমাজে বেঁচে থাকে এবং সাময়িকভাবে দল বৃদ্ধিও করে নিতে পারে।

এই সত্যও বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিবানদের অজানা নেই। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বাঙালির এই বুদ্ধিজীবী-সমাজ তথাপি নিজেদের কর্তব্য পালনে একেবারে অশক্ত হননি। দুই বাংলার বিভেদ তাঁরা রোধ করতে পারেননি। কিন্তু দুই বাংলার বিরোধ বন্ধ রাখতে তাঁরা সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৯-এর শেষে এবার বাঙালি সংস্কৃতিবানদের পক্ষে আর সেই গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে না। এমনি সময়ে পূর্ব বাংলার পূর্ব সীমান্ত থেকে 'সীমান্ত' পত্রের আহবান আমরা শুনতে পেলাম – 'সীমান্তে'র সহকারী সকল বন্ধুদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সূর্য পূর্ব দিকেই ওঠে। অন্ধকারের মধ্যেও এই আলোকচ্ছটা সেখানেই আজ বাঙালি সংস্কৃতি-সৈনিকেরা দেখতে পেল।

বোধহয় কথাটা বলা প্রয়োজন– 'সীমান্ত' সাম্যবাদীদের পত্র নয়। 'সীমান্তে' প্রধান আবেদন কবি, শিল্প ও সাহিত্যিকদের নিকট, তার প্রধান দাবি মনুষ্যত্বের নামে, 'বর্বরতা যে কারণেই ঘটুক না কেন, তা বর্বরতাই এবং বর্ববতার জয়জয়কারে কোনো মনুষ্যত্বকামী মানুষ খুশি হতে পারে না।' তাই অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বিশেষ দাবি পশ্চিমবঙ্গের কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিকট। রাজনীতি ও ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অবিশ্বাস; তিনি আহবান করেছেন, 'এ

ব্যাপারে সত্যেন মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুশোভন সরকার, সুধীন দত্ত, যামিনী রায়, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কাছে।' আর এই উদ্দেশ্যে তিনি চান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দুই বঙ্গে মিলিত পরিভ্রমণ ব্যবস্থা। সুসংবাদও তিনি জানিয়েছেন– চাটগাঁ শহরে তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা মিলে সেখানে একটি দাঙ্গা-বিরোধী প্রতিষ্ঠান এবং শান্তিফৌজও গড়ে তুলেছেন। পশ্চিম বাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ হয়তো তা শোনেন নাই। তাই আমরা বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার শিক্ষিতদের দৃষ্টি এই উদারপ্রাণ বাঙ্গালি বন্ধুর প্রবন্ধটির দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। পশ্চিম বাংলার শিল্পীরা পূর্ব বাংলার এই সংস্কৃতি-সহধর্মীর হাতে হাত মিলান।

অবশ্য 'সীমান্তে'র এ সংখ্যার সাহিত্যিক মূল্যও কম নয়– কৃষণ চন্দের 'দুই অমৃতসর' (উর্দু থেকে অনূদিত) মর্মান্তিক গল্প। কয়েকটি কবিতা বিশেষ করে জনাব মাহবুব উলম আলম চৌধুরীর 'স্মৃতি নেই, হাসিনা নেই ঃ কাকাবাবু নেই' দরদের জোরে অন্তর স্পর্শ করে। প্রবন্ধ কয়টিতে 'সীমান্তে'র উদ্দেশ্য স্পষ্ট।"

চট্টগ্রামে ১৯৯৭ সালে আমাকে সংবর্ধনা দেয়া উপলক্ষে অনোমা শিল্পীগোষ্ঠী 'অভিনন্দন' নামে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে তাতে এবনে গোলাম নবী লেখেন– 'চট্টগ্রামের সীমান্ত পত্রিকা ও তাকে অবলম্বন করে সাংস্কৃতিক বৈঠকের প্রচেষ্টায় যে প্রগতিশীল ক্রিয়াকর্মের শুরু হয়েছিল তারই সফল পরিণতি ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে হরিখোলা মাঠে অনুষ্ঠিত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা কার্জন হলের সেই বিখ্যাত সম্মেলন। ১৯৬১ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী। চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি না হলে দেশব্যাপী এ ধরনের সম্মেলন করা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের অবদান শীর্ষে' (পৃষ্ঠা ৪০)।

একই গ্রন্থে শওকত ওসমান লেখেন– 'সীমান্ত' পত্রিকা এবং পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি-বৈঠক, বৈঠক থেকে সৃষ্ট 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' এবং এগুলোর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রগতিশীল, গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্মেলন (১৯৫১) প্রভৃতি পূর্ব বাংলার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল সুরও বেঁধে দিয়েছিল। দাঙ্গাবিরোধী 'সীমান্ত' অগ্রযাত্রার মাইলফলক (পৃষ্ঠা ১৯)।

ভাষার প্রশ্নেও 'সীমান্ত' অগ্রণী এবং দুঃসাহসিক ভূমিকা নিয়েছিল। সীমান্তের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা অংগ্রহায়ণ ১৩৫৪ (ডিসেম্বর ১৯৪৭) সাতান্ন বছর আগে রাষ্ট্রভাষার উপর যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল তা হুবহু নিচে তুলে দেয়া হলো–

"পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এই নিয়ে এরমধ্যে নানা আলোচনার উদ্ভব হয়েছে। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকবৃন্দ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করেছেন। তাঁদের এ অনুরোধ মোটেই আকস্মিক নয়। স্বাভাবিক প্রেরণাই এর উৎস। প্রশ্ন, রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত? রাষ্ট্র যদি গণতান্ত্রিক হয় তবে গণের ভাষা; যে ভাষায় সে কথা বলে অকুণ্ঠিতভাবে, যার দ্বারা সে মনের ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়, সেই ভাষাই রাষ্ট্রে স্থান পাবে, এটা স্বাভাবিক। এরমধ্যে 'কিন্তু' কোথায়? কিন্তু তবুও কিন্তু'র প্রশ্ন ওঠে। এ প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তানের অগণিত জনসাধারণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না, ধ্বনিত হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কণ্ঠে। মুষ্টিমেয় হলেও তাঁদের কণ্ঠে শক্তি আছে, নইলে স্মারকলিপি বা আলোচনার দরকার হতো না, সাধারণ মানুষকেও হঠাৎ এতো উৎকণ্ঠিত হতে উঠতে হতো না– মুষ্টিমেয় কয়েকজনের চাপে পড়ে। যদি গণের ভাষা রাষ্ট্রে স্থান না পায়, তবে গণতন্ত্রের দুর্দিন বলতে হবে। গণতন্ত্রের বুলি আওড়াইলে গণতন্ত্রের মর্যাদা দেয়া হয় না। ভাষার দিক থেকে যদি বিচার করা যায়, তবে বাংলা অপাঙক্তেয় নয়। বরং পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে পরিচিতি লাভ করেছে। এর সাহিত্য পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দরবারে স্বচ্ছন্দে আসন করে নিতে পারে। যদি লোক গণনার ভিত্তিতেও একে বিচার করা যায়, তবে

পৃথিবীর কম দেশই আছে যেখানে একটি ভাষায় এত লোক কথা বলে। কিন্তু এগুলোই-বা রাষ্ট্রের ভাষার বিচার্য বিষয় হবে কেন? রাষ্ট্র যদি জনসাধারণের হয়, তবে জনসাধারণের ভাষাই রাষ্ট্রে স্থান পাবে। তা সে যতই অপাঙ্‌ক্তেয় হোক না কেন, কারণ সেই ভাষাতেই রাষ্ট্রের মঙ্গল নিহিত।

মানুষের চোখ উপড়িয়ে তাকে সুন্দর করে তোলা যায় না, জনের ভাষাকে বাদ দিয়ে জনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি তেমনি অসম্ভব। আজ দুশ' বছরের বিদেশী শাসনের বোঝা আমাদের সত্যটিকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের জ্ঞানার্জনে যে পরিমাণ মেরুদণ্ড দুর্বল হয়েছে, জ্ঞানের প্রসার সে পরিমাণ লাভ হয়নি। নিজস্ব ভাষায় যেটা আয়ত্ত করতে দু'ঘণ্টা লাগতো, বিদেশী ভাষা ছ'ঘণ্টায় সেটা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসেনি, আসবার কথাও নয়।

ভাব প্রকাশের জন্যই যদি ভাষার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সে দেশের জনসাধারণ যে ভাষায় সহজেই ভাব প্রকাশ করতে পারে, সে ভাষাই রাষ্ট্রে প্রাধান্য লাভ করবে। এরমধ্যে তর্কের স্থান কোথায়? দেশের মধ্যে বিদেশী ভাষার অনুশীলন চলতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, নিজস্ব ভাষা ছেড়ে বিদেশী ভাষাই গলাধঃকরণ করতে হবে। কেউ যদি স্বেচ্ছায় বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেন, তবে সেটা তার মহৎ গুণ ও নিষ্ঠার পরিচায়ক। কিন্তু তাই বলে একজনের ঘাড়ে বিদেশী ভাষার জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়ার মধ্যে কোনো সদুদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সরকারি দফতরে দরকার হলে বাংলা ভাষা বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কাজ যদি আজও কোনো বিদেশী ভাষায় চলতে হয়, তবে স্বাধীনতা শুধু ইতিহাসের পাতাই উজ্জ্বল করবে, জনসাধারণের সঙ্গে তার কোনোদিন চাক্ষুষ পরিচয় হবে না।"

এভাবে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার চেষ্টায় এদেশের মানবতাবাদী লেখকদের আমরা 'সীমান্তে'র ঐক্যমঞ্চে একত্রিত করি। যারা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে সরকারি নীতির লেজুড়বৃত্তি করেছিল তাদের অনেকের মোহমুক্তি ঘটে। আমাদের এই সংগ্রামের প্রতি তারাও ক্রমে সমর্থন জানানো শুরু করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শক্তিকে সংহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মার্চ তারিখে চট্টগ্রামে মহাসমারোহে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি নির্বাচিত করা হয় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে। সুফিয়া কামাল, আবুল ফজল, শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কলিম শরাফী, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, বিজন চৌধুরী প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে ঢাকা থেকে আরো শিল্পী-সাহিত্যিকের যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু 'আজাদ' পত্রিকায় সম্মেলনের বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রচার এবং পূর্ববঙ্গ সরকারের অলিখিত নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা আসতে সাহস করেননি।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন দৈনিক 'সত্যযুগে'র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘের একটি স্কোয়াড এবং সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেনা বর্মণ, ওস্তাদ বাহাদুর খান প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। এই সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। মানুষের মঙ্গল করার সদিচ্ছাকে অঙ্গিভূত করে সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, এক দেশের উপর অন্য দেশের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মানবতার স্বপক্ষে এই সম্মেলন হয়ে ওঠে একটি গণতান্ত্রিক ঐক্যমঞ্চ।

এই সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্য দৈনিক আজাদ পত্রিকা নিয়মিত সম্পাদকীয় লেখে। একে কমিউনিস্ট তৎপরতা বলে অভিহিত করে। স্থানীয় মুসলিম লীগের গুণ্ডারা সম্মেলনকে ভেঙে দেয়ার জন্য চক্রান্ত করে। আমরা জনগণকে সংঘবদ্ধ করে এই চক্রান্ত প্রতিহত করি।

এভাবে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত 'সীমান্ত' নির্ভীক ভূমিকা নিয়ে নানা অগ্নিপরীক্ষার মধ্যদিয়ে পরিণত হয় তদানীন্তন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মুখপত্র। ১৯৫২ সালে আমি চট্টগ্রাম জেলা

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হই। ভাষা শহীদদের উপর (প্রথম কবিতা) 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' দীর্ঘ কবিতাটি লিখি। এই অপরাধে আমার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়। আমি আত্মগোপনে চলে যাই। এই পরিস্থিতিতে সরকারি হামলার মুখে 'সীমান্ত'কে আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

পাঁচ বছরে নিয়মিত অনিয়মিতভাবে প্রায় আটচল্লিশ সংখ্যা সীমান্ত বের হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ে। দুঃখের বিষয় বহু খোঁজাখুঁজির পর গবেষক ড. ইসরাইল খানের প্রচেষ্টায় ছাপান্ন বছর পর মাত্র তেরটি সংখ্যা সংগৃহীত হয়েছে।

এই সংখ্যাগুলো একত্রে হুবহু সম্পাদনা করে ছাপিয়ে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন গবেষক ড. ইসরাইল খান এবং আমার স্ত্রী জওশন আরা রহমান।

'সীমান্ত' এখন ইতিহাসের অন্তর্গত। 'সীমান্তে'র পুরানো সংখ্যাগুলো পুনরায় প্রকাশের মাধ্যমে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, স্ফূরণ, তার আত্মমর্যাদার উদ্ভাস এবং ওই সময়ের সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুন অসাম্প্রদায়িক ধারা ও ইতিহাস পাঠক সমাজের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
সীমান্ত
বাড়ি-৪৮, সড়ক-২০, সেক্টর-৩
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

সূচিপত্র

১ বর্ষ ১ সংখ্যা কার্তিক ১৩৫৪
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী
সুচরিত চৌধুরী

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (বাণী) শুভেচ্ছা
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (প্রবন্ধ) পদ্মাবতী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ
আশুতোষ চৌধুরী (গাঁথাচিত্র) স্বপ্নের জয়
মাহবুব-উল আলম (ব্যক্তিগত) সীমান্ত
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (প্রবন্ধ) বাংলার গ্রাম
মঈনুদ্দীন (কথিকা) পাকিস্তানের আসল রূপ
অন্নদাশঙ্কর রায় (কবিতা) বাণী
ওহীদুল আলম (কবিতা) একটি কবিতা
জীবনকুমার চক্রবর্তী (কবিতা) নববধূ
মাহবুব উল আলম চৌধুরী (কবিতা) স্বাধীনতা
সুবোধরঞ্জন রায় (কবিতা) প্রতীক্ষা
সুধাংশু সরকার (কবিতা) ভয়াল
সায়ফুল আলম (কবিতা) টিকটিকি
রেবতীমোহন চৌধুরী (কবিতা) রূপ
আবুল ফজল (গল্প) পুত্রার্থে ভার্যা
শুভাশীষ চৌধুরী (গল্প) জীবন ও আর্ট
পরিমল কান্তি রায় (গল্প) আবরণ
ননী সেনগুপ্ত (প্রবন্ধ) বাংলা ভাষার রূপান্তর
শুভাশীষ চৌধুরী (আলোচনা) রূপায়ন (চলচ্চিত্র বিষয়ে)
প্রভাতকুমার সেন (আলোচনা) বেতার প্রসঙ্গ ও শারদীয়ার বেকর্ড

১ বর্ষ ২ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৪
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী
সুচরিত চৌধুরী

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (প্রবন্ধ) প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ও মসুলমান
যোগেশচন্দ্র সিংহ (প্রবন্ধ) ধর্মের গ্লানি
বেগম সুফিয়া কামাল (কবিতা) রক্তাক্ত দিনের শেষে
মাহবুব উল আলম চৌধুরী (কবিতা) মাটি
বঙ্কিম সেন (কবিতা) যাত্রা
সুধাংশু সরকার (কবিতা) উদ্বাস্তু
অচিন্ত্য চক্রবর্তী (কবিতা) ধ্রুবতারা
আবদুস সালাম (গান) বিরাগী
আবুল ফজল (গল্প) পুত্রার্থে ভার্যা
এ. বারী ওয়ারেসী (গল্প) সেও ভালোবাসত

এবনে গোলাম নবী (গল্প) নতুন সমস্যা
সুচরিত চৌধুরী (আলোচনা) নতুন লেখা (আলোড়ন, কাফেলা, ইনছাফ, নকীব)
এবনে গোলাম নবী (আলোচনা) প্রসঙ্গ ঃ রাষ্ট্রভাষা; সাংস্কৃতিক সংকট

১ বর্ষ ৩ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৪
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী
সুচরিত চৌধুরী

জীবনকুমার চক্রবর্তী (প্রবন্ধ) ছাত্রপত্র ঃ সুকান্ত ভট্টাচার্য
বিভুতি চৌধুরী (কবিতা) দুঃস্বপ্ন
রবীন্দ্র মজুমদার (কবিতা) দ্বিখন্ড
ওহীদুল আলম (কবিতা) একটি তরুণের অকাল বিয়োগ
মাহবুব উল আলম চৌধুরী (কবিতা) জীবন
সুচরিত চৌধুরী (কবিতা) ইংগিত
মাহবুব-উল আলম (গল্প) স্থলাতঙ্ক
মুনীর চৌধুরী (গল্প) শবেবরাত
শুভাশীষ চৌধুরী (গল্প) ইতিহাস
শুভাশীষ চৌধুরী (আলোচনা) পরিচালক বড়ুয়া
অধ্যাপক আবুল ফজল (আলোচনা) বিয়োগপঞ্জী : কুদ্দুস
অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (আলোচনা আলাওল) পদ্মাবতী সম্পাদনায় সাহিত্য বিশারাদ
এবনে গোলাম নবী (আলোচনা) সংস্কৃতি বৈঠক

২ বর্ষ ১ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৫, জানুয়ারি ১৯৪৯
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী
সুচরিত চৌধুরী

সৈয়দ জামাল আহমেদ (প্রবন্ধ) সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তি
শওকত ওসমান (অনুবাদ) ইকবালের কবিতা
মাহবুব উল আলম চৌধুরী (কবিতা) সভ্যতা
অচিন্ত্য চক্রবর্তী (কবিতা) একটি রক্তাক্ত উদ্ধত বুক
মোসফেকা রহমান (কবিতা) ঝড়
নুরুন্নাহার (কবিতা) পাহারা
সুচরিত চৌধুরী (কবিতা) শহীদের উদ্দেশ্যে
এবনে গোলাম নবী (গল্প) রমজান
গোপালচন্দ্র বিশ্বাস (গল্প) এয়াকুবের বেটা
শহীদুল্লাহ সাবের (আলোচনা) সীমান্ত
সৈয়দ জামাল আহমেদ (আলোচনা) সংস্কৃতি বৈঠক

২ বর্ষ ২ সংখ্যা মাঘ ১৩৫৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯

সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী
সুচরিত চৌধুরী

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (প্রবন্ধ) বড়যোগীর পুঁথি
এস এম বজলুল হক (কবিতা) তাতারি তৈমুর কোথা
সবুজ চৌধুরী (মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ছদ্মনাম, কবিতা) বিবর্তন
চলন্তিকা রায় (সুচরিত চৌধুরীর ছদ্মনাম, কবিতা) আমাদের কবিতা
মাহবুব উল আলম চৌধুরী (নাটক) আগামীকাল
শওকত ওসমান (উপন্যাস) লালবানু
সমরেন্দ্র দত্ত (গল্প) সোনামিঞা মাঝি
মাহবুব উল আলম চৌধুরী (আলোচনা) আমাদের সাহিত্য
দৌলতর রহমান (আলোচনা) আণবিক ভবিষ্যৎ

২ বর্ষ ৫ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৬, অক্টোবর ১৯৪৯
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী
সুচরিত চৌধুরী
[২ বর্ষ ৪ সংখ্যা পাওয়া যায়নি
২ বর্ষ ৫ সংখ্যাও খন্ডিত
প্রথম দিককার পৃষ্ঠাগুলো পাওয়া যায়নি]

ননী সেনগুপ্ত (প্রবন্ধ) এ যুগের কবিগুরু
চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় (কবিতা) প্রতিশ্রুতি
সুশান্ত চৌধুরী (কবিতা) কয়লা
চলন্তিকা রায় (সুচরিত চৌধুরীর ছদ্মনাম, কবিতা) জিজ্ঞাসা
মোহাম্মদ শাহেদউদ্দিন (মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ছদ্মনাম, কবিতা) একটি কবিতা
শওকত ওসমান (উপন্যাস) লালবানু
দিলীপ মুখোপাধ্যায় (গল্প) মোহনবাঁশী
শুধু চৌধুরী (সুচরিত চৌধুরীর ছদ্মনাম, গল্প) সব্যসাচী
শ্রী সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, তর্কতীর্থ (আলোচনা) প্রাচীন চট্টগ্রামের ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক রূপ
আবুল ফজল (আলোচনা) মরহুম আহমদ সগীর চৌধুরী

৩ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৭
দাঙ্গা-বিরোধী সংখ্যা
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (প্রবন্ধ) পশ্চিমবঙ্গের কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের নিকট একটি আবেদন
আবুল ফজল (প্রবন্ধ) ইতিহাসের আহবান
শ্রী যোগেশচন্দ্র সিংহ (প্রবন্ধ) যুগের সীমান্তে
গোপাল বিশ্বাস (প্রবন্ধ) ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতি
অন্নদাশঙ্কর রায় (কবিতা) নজরুলকে
শওকত ওসমান (কবিতা) হুঁশিয়ার

চলন্তিকা রায় (সুচরিত চৌধুরীর ছদ্মনাম, কবিতা) সন্ধ্যার কাব্য
মতিউল ইসলাম (কবিতা) খন্ডিত এদেশে
প্রাথমিকা প্রামাণিক (মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ছদ্মনাম, কবিতা) উদ্বাস্তু
অচিন্ত্য চক্রবর্তী (কবিতা) মানুষ
ওহীদুল আলম (কবিতা) জ্ঞান ও প্রেম
মাহবুব উল আলম চৌধুরী (কবিতা) স্মৃতি নেই : হাসিনা নেই : কাকাবাবু নেই
এবনে গোলাম নবী (একাঙ্কিকা) নাটকের অন্তরালে
কৃষণ চন্দর (গল্প) দুই অমৃতসর (অনুবাদ : শওকত ওসমান)
সায়ফুল আলম (গল্প) উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রতন
আলোচনা (সম্পাদকীয়) সংকট

৩ বর্ষ ২ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৭
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী

কৃষণ চন্দর (প্রবন্ধ) কোরীয় রণাঙ্গনে আমেরিকার প্রথম নিহত সৈনিকের প্রতি খোলা চিঠি (ইংরেজী থেকে অনুবাদ মাহবুব উল আলম চৌধুরী, মূল পত্রিকায় অনুবাদকের নাম ছিল না)
দুটি নিগ্রো লোক-সঙ্গীত (সঙ্গীত) অনুবাদক মনোয়ার চৌধুরী (কবি সানাউল হক)
মতিউল ইসলাম (কবিতা) স্বাধীনতা
অচিন্ত্য চক্রবর্তী (কবিতা) আমি সাড়া দিই
মাহবুব উল আলম চৌধুরী (কবিতা) জাপানীরা হিরোহিতোর জন্য হারিকিরি করে
শওকত ওসমান (উপন্যাস) নিশো (পি. লুকনিৎসকির থেকে অনুবাদ)
গোপাল বিশ্বাস (গল্প) মোহাজেরিন
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন (আলোচনা) বিশ্ব-যুদ্ধ ও শান্তি
সয়ীদুল হাসান (সংস্কৃতি) সংস্কৃতি সংবাদ
মাহবুব উল আলম চৌধুরী (সম্পাদকীয়) 'সীমান্ত' সম্পর্কে বক্তব্য
বিশ্বশান্তির ডাকে স্বাক্ষর দিন (আহবান, মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সংগঠনের বিজ্ঞপ্তি)
স্টকহোম বিশ্বশান্তি কমিটির আহবান

৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, ১৯৫০
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী

জনষ্ট্রাচি (প্রবন্ধ ঃ অনুবাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী) কড্ওয়েল ও গণতন্ত্র
আলমগীর (মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ছদ্মনাম, কবিতা) স্বদেশ
সমরেন্দ্র দত্ত (কবিতা) স্কেচ
দেবপ্রিয় বড়ুয়া (কবিতা) তোমাকে
রুধির ভট্টাচার্য (কবিতা) একটি অঙ্গীকার
উইলিয়াম হাউইট (গল্প) শ্মশান কর্মীদের গল্প (অনুবাদ সানাউল হক)
বলবন্ত সিং (গল্প) কালক্রোশ (উর্দু থেকে অনুবাদক শওকত ওসমান)
সিরাজুল ইসলাম (গল্প) দু'তারা (আজিজ মিছিরের ছদ্মনাম)
দানেশমন্দ খাঁ-নূতন লেখা (শওকত ওসমানের ছদ্মনাম)

শওকত ওসমান (উপন্যাস) নিশো
মোহাম্মদ শাহেদ উদ্দীন-পত্রিকা প্রসঙ্গ (সম্পাদকের ছদ্মনাম)
মতামত-আকবর হোসেন ও সজল চৌধুরী
আলোচনা-বিয়োগপঞ্জী
জর্জ বার্ণাড শ', বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, আবদুল হক দোভাষ, মৌলানা মনিরুজ্জামান, ইব্রাহীম খাঁ

৩ বর্ষ ৪ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৭, নভেম্বর ১৯৫০
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী

দীপক আচার্য (প্রবন্ধ) তুর্কী কবি নাজিম হিক্‌মত
আলাউদ্দিন আল আজাদ (কবিতা) অলিখিত উপন্যাস
শফিকউদ্দিন আহমেদ (কবিতা) মৃত্যুঞ্জয়
জামালুদ্দিন (কবিতা) এই সীমান্তে
শওকত ওসমান (অনূদিত উপন্যাস) নিশো
গোপাল বিশ্বাস (গল্প) একাট্টা
এলব্যার্ট মাল্‌জ (গোপাল বিশ্বাস অনূদিত নাটক) সুখী মানুষ
ক্লাড মরগ্যান (ভাষণ) পল রবসনের ভাষণ (অনুবাদিকা সুমিতা মুৎসুদ্দি)
এ. টি. এম. শামসুদ্দিন (আলোচনা) পাকিস্তান ঃ গঠনতন্ত্র
ইরশাদ হোসেন (আলোচনা, পত্রিকা প্রসঙ্গ শারদীয়া ও ঈদসংখ্যা)
আবিদ আলী (আলোচনা) পুস্তক পরিচয়
মতিউল ইসলাম প্রণীত : কায়েদে আজম তোমার জন্য।

৩ বর্ষ ৫ সংখ্যা মাঘ ১৩৫৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী

ইলিয়া এরেন বুর্গ (প্রবন্ধ) যুদ্ধকে আমরা ঠেকাবই (অনুবাদক : গোপাল বিশ্বাস)
হাওয়ার্ড ফাস্ট (কবিতা) নাজিম হিকমতের প্রতি (অনুবাদক : সানাউল হক)
আতাউর রহমান (কবিতা) কাল : অতীত ও বর্তমান
আজিম চৌধুরী (কবি সানাউল হকের ছদ্মনাম) ছড়া
দিলদার চৌধুরী (সানাউল হকের ছদ্মনাম, গল্প) অর্পণী
সিরাজুল ইসলাম (গল্প) ঘটনা
সু. র. আখতার (গল্প) প্রাণের আম্মাকে
পি. লুকনিৎসকি (উপন্যাস) নিশো
অনিমেষ রায় ও সিরাজুল ইসলাম (আলোচনা) নূতন লেখা বা পুস্তক সমালোচনা
চিরঞ্জীব শর্মা (গান) শান্তির গান
প্রাণগোপাল নাথ (আলোচনা) মতামত
ইয়াকুব খান (আলোচনা) মতামত

৪ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৮

(সংস্কৃতি-সম্মেলন সংখ্যা ১৯৫১)
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত মূল সভাপতির অভিভাষণ
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (অভিভাষণ) সংস্কৃতিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ
বেগম সুফিয়া কামাল (অভিভাষণ) সংস্কৃতিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ
মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (প্রবন্ধ) কাব্যে সমাজচেতনা ও ঐতিহ্যবোধ (সংস্কৃতি সম্মেলনে পঠিত)
আবুল ফজল (প্রবন্ধ) সংস্কৃতি (সংস্কৃতি সম্মেলনে পঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির অভিভাষণ)
মোহাম্মদ ফেরদাউস খান (প্রবন্ধ) মাতৃভাষার মর্যাদা (সংস্কৃতি সম্মেলনে পঠিত)
আলাউদ্দিন আল আজাদ (কবিতা) সীমান্ত শহরকে
শামসুর রাহমান (কবিতা) একটি আত্মপরীক্ষা
সমরেন্দ্র দত্ত (কবিতা) জনম দুঃখিনী মা
নাজিম হিকমত (কবিতা) মাটি বন্ধু শত্রু তুমি ও পৃথিবী (অনুবাদক : রাম বসু)
পি. লুকনিৎসকি (উপন্যাস, অনুবাদ শওকত ওসমান) নিশো
শওকত ওসমান (গল্প) পিতা-পুত্র
অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী (চিত্র প্রদর্শনীর সমালোচনা) যে ছবির জন্ম হয়নি
আবদুল গনি (সংবাদ পরিক্রমা) সংস্কৃতি সংবাদ
সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রেরিত বাণী
(ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অন্নদাশঙ্কর রায়, মুহম্মদ এনামুল হক)
সম্পাদকীয়

৫ বর্ষ ১ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫৯, জুন ১৯৫২
(হিসাবে গরমিল থাকলেও পত্রিকার গায়ে ছাপা আছে ৭ বর্ষ)
সম্পাদক : মাহবুব উল আলম চৌধুরী

চৌধুরী হারুনর রশিদ (প্রবন্ধ) মাননীয় লিয়াকত আলী খান
মোতাহের হোসেন চৌধুরী (প্রবন্ধ) নজরুল ইসলাম ও রেনেসাঁস
সুলেখা সান্ন্যাল (গল্প) ঘেন্না
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (প্রবন্ধ) রোসাঙ্গ শহর কোথায়?
অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী (কবিতা) দুর্বার
ইমামুর রশিদ (কবিতা) উজ্জীবন
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী (কবিতা) মানুষের কাব্য
আতাউর রহমান (কবিতা) নজরুল
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (গল্প) নোংগর
মাহবুব উল আলম চৌধুরী – সংস্কৃতি সংবাদ
মাহবুব উল আলম চৌধুরী – পুস্তক সমালোচনা
এবনে গোলাম নবী – পুস্তক সমালোচনা

সীমান্ত

পূর্ব বাংলার একমাত্র প্রগতিশীল শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

অভিমত

.... 'সীমান্ত' কাগজের ১ম সংখ্যা পাঠকের হাতে পৌঁছবার পূর্বেই দেখবার সৌভাগ্য হলো। বাংলাদেশের অধিকাংশ আজ 'বোবা'। এ কাগজ যদি তাদের প্রাণের কথা ব্যক্ত করতে পারে তবেই এ কাগজ প্রকাশ সার্থক হবে।

–ডা. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (প্রধানমন্ত্রী : পশ্চিম বাংলা)২৯-১০-১৯৪৭

....সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম সাহিত্যে আবার নূতন পথ সৃষ্টি করবে এ ভরসা আমরা করতে পারি। বাংলা সাহিত্যের কারবার এখনো মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে। জনগণমনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা তারই জন্যে পথ রচনা করুক সীমান্তের অগ্রপথিকরা।

–মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (মন্ত্রী : পূর্ব পাকিস্তান) ৮-১০-১৯৪৮

....অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হিন্দু-মুসলমান লেখকগণ সমবেতভাবে এই পত্রিকাযোগে ভাষাজননীর সেবা করিতেছেন। প্রবীণ ও নবীন লেখকগণ 'সীমান্তে' সম্মিলিত হইয়াছেন। আমি ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব কামনা করি।

–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১২-১-১৯৪৮

....চট্টগ্রাম ঢাকার ওপর টেক্কা মারিল। সীমান্ত প্রদেশের এই সাহিত্যমশাল প্রচুর আলোদান করবে এবং জাতির সত্যপথের নির্দেশ দেবে।

–অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, ১২-১-১৯৪৮

....চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এই মাসিকপত্র অদূর ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য শিল্পের জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠবে।

–কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (সম্পাদক : ক্রান্তি) ২৭-১১-১৯৪৮

.....বাংলার বিখ্যাত মুসলমান ও হিন্দু সাহিত্যিকবৃন্দের সরস রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ সংকলনী। সাহিত্যক্ষেত্রে ইহার শুভাগমন জয়যুক্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

–আনন্দবাজার, ৪-১-১৯৪৮

....এই নবজাত পত্রিকাটিতে পুরাতন ও নবাগত অনেকের সন্ধান মিলিল।

–আনন্দবাজার, ৪-১-১৯৪৮

....প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, সঙ্গীত, রূপায়ন, পুস্তক পরিচয় প্রভৃতি বিভাগীয় আলোচনায় সমৃদ্ধ। 'সীমান্ত' ঘরে ঘরে আদৃত হইবে আশা করি।

পরিচয় : মাসিক পত্রিকা : ১৩৫৭ শারদীয় সংখ্যা, কোলকাতা
সীমান্ত দাঙ্গাবিরোধী সংখ্যা সম্পর্কে গোপাল হালদারের মূল্যায়ণ।

দাঙ্গাবিরোধী সাহিত্যিকদের আহ্বান

"হত্যার অধ্যায় থেমেছে, তিনমাস ধরে আমরা দিল্লী-করাচির চুক্তিকৃত সৌহার্দ্যের আবহাওয়ায় বাস করছি। দিল্লীর সরকারি হিসাবে শুনেছি, লোকের আস্থা ফিরে আসছে। এবং শিয়ালদহ স্টেশনে দেখছি সে আস্থার অবস্থা। পূর্ব বাংলার সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এমনি সময়ে হাতে এসে পৌঁছল 'সীমান্ত' নামে মাসিকপত্রের 'দাঙ্গাবিরোধী সংখ্যা'। পূর্ব বাংলায় দাঙ্গাবিরোধী মানুষ আছেন এবং তাঁরা আপনাদের সেই মতামত ঘোষণা করতে ভীত নন। এই সংবাদ আমরা পশ্চিম বাংলার মানুষরা কয়জন জানি? কয়জন তা বিশ্বাস করি? তবু সেই অভ্রান্ত ঘোষণা নিয়ে এসেছে 'সীমান্ত' আর সে একাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের একাধিক বাংলা মাসিকপত্রে এই প্রমাণ। পশ্চিম বাংলা থেকে এমনি 'কোনো দাঙ্গাবিরোধী' সংখ্যার আশ্বাস দিয়ে কোনো সাময়িকী এ সময়ে পূর্ব বাংলায় গিয়েছে কিনা জানি না। এ প্রশ্ন তুলতেও ভয় পাই। কারণ তৎক্ষণাৎই উঠে পড়বে এই তর্ক – কোন বাংলা কতটা দাঙ্গামুখী। তারপর কে ঢিল ছুঁড়ল, প্রথম কবে; আর কারা হত্যা করেছে বেশি, কারা সেদিকে কতটা পিছিয়ে আছে। অসহ্য! ঘৃণার সঙ্গে এ তর্ক বর্জন করতে চাই।

তথাপি জিজ্ঞাসা করতে হয়– পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি-সেবকদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই ১৯৫০-এর দুর্দিনে এরূপ কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে কিনা। কারণ, এখনো বাঙালি সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র পশ্চিম বাংলা। আর সে সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা। কিন্তু এরূপ সুস্পষ্ট কোনো প্রয়াস কলকাতার সংস্কৃতির সেবকদের পক্ষ থেকে সংস্কৃতির এই দুর্যোগে হয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না। দু'একটি মিলন চক্রের চেষ্টার কথা জানি, তাও সার্থক আকার লাভ করতে পারেনি।

অথচ একথা সত্য যে, কি পূর্ব বাংলা, কি পশ্চিম বাংলায় কোনোখানেই দুষ্কৃতকারী বা দাঙ্গাজীবীদের সংখ্যা বড় জোর দু'এক লক্ষের বেশি নয়। সাধারণ সুস্থ, শান্তিকামীদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, আসলে তাঁরাই শতকরা ৯০ জন। কিন্তু তাঁরা সক্রিয় নন, সংগঠিত হতে জানেন না বরং নানাবিধ অকল্যাণকর প্রচারে তাঁদের সেই শুভবুদ্ধিও এক একবার আচ্ছন্ন হয়। আর সাধারণ সময়েও সংগঠনেচ্ছা তাঁদের অবসন্ন হয়ে থাকে। তাঁদের অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তার এই সুযোগ নিয়েই দাঙ্গাজীবীরা সমাজে বেঁচে থাকে এবং সাময়িকভাবে দল বৃদ্ধিও করে নিতে পারে।

এই সত্যও বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিবানদের অজানা নেই। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বাঙালির এই বুদ্ধিজীবী-সমাজ তথাপি নিজেদের কর্তব্য পালনে একেবারে অশক্ত হননি। দুই বাংলার বিভেদ তাঁরা রোধ করতে পারেননি। কিন্তু দুই বাংলার বিরোধ বন্ধ রাখতে তাঁরা সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৯-এর শেষে এবার বাঙালি সংস্কৃতিবানদের পক্ষে আর সেই গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে না। এমনি সময়ে পূর্ব বাংলার পূর্ব সীমান্ত থেকে 'সীমান্ত' পত্রের আহবান আমরা শুনতে পেলাম – 'সীমান্তে'র সহকারী সকল বন্ধুদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সূর্য পূর্ব দিকেই ওঠে। অন্ধকারের মধ্যেও এই আলোকচ্ছটা সেখানেই আজ বাঙালি সংস্কৃতি-সৈনিকেরা দেখতে পেল।

বোধহয় কথাটা বলা প্রয়োজন– 'সীমান্ত' সাম্যবাদীদের পত্র নয়। 'সীমান্তে' প্রধান আবেদন কবি, শিল্প ও সাহিত্যিকদের নিকট, তার প্রধান দাবি মনুষ্যত্বের নামে, 'বর্বরতা যে কারণেই ঘটুক না কেন, তা বর্বরতাই এবং বর্ববতার জয়জয়কারে কোনো মনুষ্যত্বকামী মানুষ খুশি হতে পারে না।' তাই অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বিশেষ দাবি পশ্চিমবঙ্গের কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিকট। রাজনীতি ও ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অবিশ্বাস; তিনি আহবান করেছেন, 'এ ব্যাপারে সত্যেন মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুশোভন সরকার, সুধীন দত্ত, যামিনী রায়, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কাছে।' আর এই উদ্দেশ্যে তিনি চান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দুই বঙ্গে মিলিত পরিভ্রমণ ব্যবস্থা। সুসংবাদও তিনি জানিয়েছেন– চাটগাঁ শহরে তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা মিলে সেখানে একটি দাঙ্গা-বিরোধী প্রতিষ্ঠান এবং শান্তিফৌজও গড়ে তুলেছেন। পশ্চিম বাংলার শিল্পী ও

সাহিত্যিকগণ হয়তো তা শোনেন নাই। তাই আমরা বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার শিক্ষিতদের দৃষ্টি এই উদারপ্রাণ বাঙ্গালি বন্ধুর প্রবন্ধটির দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। পশ্চিম বাংলার শিল্পীরা পূর্ব বাংলার এই সংস্কৃতি-সহধর্মীর হাতে হাত মিলান।

অবশ্য 'সীমান্তে'র এ সংখ্যার সাহিত্যিক মূল্যও কম নয়– কৃষণ চন্দের 'দুই অমৃতসর' (উর্দু থেকে অনূদিত) মর্মান্তিক গল্প। কয়েকটি কবিতা বিশেষ করে জনাব মাহবুব উলম আলম চৌধুরীর 'স্মৃতি নেই, হাসিনা নেই ঃ কাকাবাবু নেই' দরদের জোরে অন্তর স্পর্শ করে। প্রবন্ধ কয়টিতে 'সীমান্তে'র উদ্দেশ্য স্পষ্ট।"

কিন্তু এই উদ্দেশ্যর স্পষ্টতাই যথেষ্ট নয়, 'সীমান্তে'র বন্ধুদের আজ একথা আমরা সহকর্মীর সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়ে জানাতে চাই। ১৯৪৬ থেকে আজ তিন বৎসর আমরা বাংলায় সংস্কৃতিবাদীরা শুধু এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বার বার দাঙ্গাবাজ ও দাঙ্গা-প্ররোচকদের বিরুদ্ধে সমবেত হতে গিয়েছি। স্বার্থকতা আমরা একেবারেই লাভ করিনি তা নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য যে আমাদের সিদ্ধ হয়নি তাও মানতেই হবে। 'দুই রাষ্ট্র' এক দেশ, এক অর্থনীতি, এক সংস্কৃতি' এমনি একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে আমরা 'পনেরই আগস্টে'র বিভেদকে মেনে নিতেও চেষ্টা করেছি। কিন্তু একটু পরেই দেখলাম রাজনীতির খড়্গ তাতে মাথার উপর উঁচিয়ে উঠল। যারা বাঙলাকে দ্বিখন্ড করেছে তারা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও বাঙালি সংস্কৃতিকে অখন্ড থাকতে দেবে না– একথা ক্রমশই সুস্পষ্ট হলো। বোঝা গেল, রাজনৈতিক ভেদরেখা অমোঘ করবার উদ্দেশ্যই অর্থনৈতিক বিভেদও প্রবর্তিত করা হবে, আর ক্রমেই বাঙালি ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যও বিপন্ন হবে। আজ দুই বৎসরে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে 'আগস্টের অভিশাপের' অর্থ কি– মাউন্টব্যাটন-নীতিতে স্বাধীনতা আসেনি, এসেছে বিভেদ। আর যারা মাউন্ডব্যাটন-নীতিতে 'নকল বাদশাহী' ভোগ করছে তারা এই সাম্রাজ্যবাদী-ভেদকে দুরতিক্রম করবে। অর্থাৎ তাদের নিকট বাঙালির জাতীয় ঐক্যের, জাতীয় অর্থনীতির, জাতীয় ঐতিহ্যের, জাতীয় সংস্কৃতির কোনো মূল্য নেই। সাম্রাজ্যবাদের এই চালটাই আজ এই দাঙ্গার অবস্থা জিইয়ে রেখে ভারত ও পাকিস্তান দুই জনাকেই পরস্পরের শত্রু ও ইংরেজ-মার্কিনের কৃপাপ্রার্থী করে রাখা; পুরাদস্তর যুদ্ধ না বাধিয়ে বরং ভাবীযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি রূপে দুই রাষ্ট্রকেই মুঠোর মধ্যে রাখা। ব্যাহত স্বাধীনতা সংগ্রাম তাই আবার আরম্ভ না করলে এই চক্রান্তে ও অভিশাপেই আমরা উৎসন্নে যাবো। আর তা সম্ভব করতে হলে সাময়িকভাবে যেমন দুই বাঙলার শান্তি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সেই শান্তির সৈনিক হিসেবে গণতান্ত্রিক সংগঠন। নেহরু-লিয়াকত চুক্তিতে নয়, একমাত্র দুই বাঙলার মজুর-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর গণতন্ত্রকামী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেই দু'বাংলার মাইনরিটি বা সংখ্যালঘুরা বাঁচতে পারে, সারা বাঙালি জাতির এই শাপমুক্তি সম্ভব।

–গোপাল হালদার